জাল না করা যায় তার জন্য আগে থেকেই তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি। অনেকে তামার মুদ্রা জাল করে। বাজার থেকে জাল মুদ্রা তুলে নিতে রাজকোষ থেকে অনেক সোনা ও রুপোর মুদ্রা ব্যয় করতে বাধ্য হন সুলতান।

- মহম্মদ বিন তুঘলক কয়েকজন অনভিজাত, সাধারণ ব্যক্তিকে প্রশাসনে উঁচু পদে বসিয়েছিলেন। এদের মধ্যে একজন মদ তৈরি করতেন, একজন ছিলেন নাপিত, একজন ছিলেন পাচক ও দুজন ছিলেন মালি। তুর্কি অভিজাতদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সুলতান এভাবে সাধারণ হিন্দুস্তানিদের ওপর নির্ভরতা দেখিয়েছিলেন।

➪ মহম্মদ বিন তুঘলকের কাজকর্মের মধ্যে কোন কোন দিক ঠিক ছিল বলে তুমি মনে করো?

➪ তুমি কি মনে করো যে সুলতান কিছু ভুল করেছিলেন? কী কী ভুল করেছিলেন বলে তুমি মনে করো?

➪ তুমি যদি ওই যুগে নতুন রাজধানী তৈরি করতে তা হলে কেমন অঞ্চল বাছতে ও কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে?

➪ দেশের মুদ্রা জাল হলে কী কী অসুবিধা হতে পারে বলে তুমি মনে করো?

➪ মহম্মদ বিন তুঘলক প্রায় সাতশো বছর আগে শাসন করতেন। এতবছর পরেও তাঁর কাজকর্মের থেকে আমরা কী শিখতে পারি?

➪ তোমার শ্রেণির বন্ধুদের মধ্যে ছোটো ছোটো দল করে নাও। এবারে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের কাজকর্মের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি সাজিয়ে বন্ধুদের মধ্যে বিতর্ক জমিয়ে তোলো।

ছবি ৪.১ : দৌলতাবাদ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, মহারাষ্ট্র।

মহম্মদ বিন তুঘলকের উত্তরসূরি ফিরোজ শাহ তুঘলকের (১৩৫১-'৮৮খ্রিঃ) শাসনকালে একদিকে যেমন যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেছে, তেমনি বেশ কিছু জনকল্যাণের সংস্কারও করা হয়েছে। ক্রমাগত যুদ্ধ করেও তিনি সুলতানি শাসনের বাইরে চলে যাওয়া এলাকাগুলোর ওপর দিল্লির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। এর থেকে মনে হয় যে তিনি সামরিক নেতা হিসাবে তত দক্ষ ছিলেন না।

টুকরো কথা

ফিরোজ শাহের সামরিক অভিযান

ফিরোজ শাহের সামরিক অভিযানের একটা বড়ো উদ্দেশ্য ছিল দাস জোগাড় করা। ফিরোজ শাহের ১,৮০,০০০ দাস ছিল। তাদের জন্য একটা আলাদা দপ্তর খোলা হয়েছিল। রক্ষীবাহিনীতে, কারখানায়, বিভিন্ন দপ্তরে দাসরা নিযুক্ত হতো ও বেতন পেত। এভাবে সুলতান একটি অনুগত বাহিনী বানাতে চেয়েছিলেন।

মানচিত্র ৪.৫ : খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের গোড়ায় ভারতবর্ষ

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

সৈয়দ এবং লোদি সুলতানদের শাসনকালে (১৪১৪-১৫২৬খ্রিঃ) দিল্লি সুলতানির আকার অনেক ছোটো হয়ে এসেছিল। জৌনপুর, গুজরাট, মালওয়া ও বাংলায় স্বাধীন সুলতানি রাজ্য গড়ে উঠেছিল। রাজপুতানার মেওয়াড় ও আলওয়াড় ও দোয়াবের হিন্দু শাসকরা সুলতানি শাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। এছাড়া ছিল স্বাধীন রাজ্য কাশ্মীর।

তবে সুলতান বহলোল লোদির শাসনকালে (১৪৫১-'৮৯খ্রিঃ) জৌনপুর রাজ্য দিল্লি সুলতানির অন্তর্ভুক্ত হয়।

আফগান সুলতানদের শাসনের উল্লেখযোগ্য দিক হলো এই সময়ে রাজতন্ত্র নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছিল। সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা খিজির খান (১৪১৪-'২১খ্রিঃ) নিজে কখনো সুলতান উপাধি নেননি। তিনি একদিকে তুর্কো-মোঙ্গল শাসকদের প্রতি আনুগত্য জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে তিনি পূর্ববর্তী তুঘলক শাসকদের নাম খোদাই করা মুদ্রা তাঁর রাজ্যে চালু রেখেছিলেন। মধ্যযুগের ভারতে এই রকম ঘটনা আগে বা পরে কখনো ঘটেনি।

লোদি সুলতানদের শাসনকালে (১৪৫১-১৫২৬খ্রিঃ) সুলতানের ক্ষমতা খানিকটা বেড়েছিল। সুলতান বহলোল লোদি আফগানদের সাবেকি রীতি মেনে অন্যান্য আফগান সর্দারদের সঙ্গে আসন ভাগ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু লোদি আফগানদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করাও ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। পাশের জৌনপুর রাজ্য দখল করা ছিল তারই নমুনা। পরবর্তী শাসক সিকান্দর লোদি (১৪৮৯-১৫১৭খ্রিঃ) অন্যান্য আফগান সর্দারদের সঙ্গে বহলোল লোদির মতো ক্ষমতা ভাগাভাগির নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। আফগান সর্দারদের জানানো হয় যে, তারা একান্তভাবেই সুলতানের নিয়ন্ত্রণের অধীন। সুলতানের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরেই তাদের ভালো-মন্দ নির্ভর করত। এইভাবে তিনি আফগান সর্দার ও সাধারণ জনগণ উভয়ের ওপরেই নিজের সার্বভৌমিকতা প্রতিষ্ঠা করেন।

ছক ৪.১ : এক নজরে দিল্লির সুলতানি শাসন

শাসন	সময়কাল	প্রধান শাসকবৃন্দ
মামেলুক (দাস)	১২০৬-১২৯০খ্রিঃ	কুতুবউদ্দিন আইবক, ইলতুৎমিশ রাজিয়া, গিয়াসউদ্দিন বলবন
খলজি	১২৯০-১৩২০খ্রিঃ	জালালউদ্দিন খলজি আলাউদ্দিন খলজি
তুঘলক	১৩২০-১৪১২খ্রিঃ	মহম্মদ বিন তুঘলক ফিরোজ শাহ তুঘলক
সৈয়দ	১৪১৪-১৪৫১খ্রিঃ	খিজির খান
লোদি	১৪৫১-১৫২৬খ্রিঃ	বহলোল লোদি, সিকান্দর লোদি

মনে রেখো

সৈয়দ ও লোদি শাসকরা ছিলেন আফগান। এর আগের শাসকরা ছিলেন তুর্কি। তাই দিল্লির সুলতানদের শাসনকে একসঙ্গে তুর্কো-আফগান শাসন বলা হয়।

৪.৪ মানচিত্রের সঙ্গে ৪.৫ মানচিত্রের তুলনা করো। এই মানচিত্রে নতুন কোন কোন রাজ্য দেখতে পাচ্ছ তার তালিকা করো।

টুকরো কথা

পানিপতের প্রথম যুদ্ধ

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপতে বাবরের সঙ্গে ইব্রাহিম লোদির যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বাবর তুর্কিদের থেকে শেখা এক ধরনের কৌশল ব্যবহার করেছিলেন। একে বলা হয় 'রুমি' কৌশল। মুঘলদের ঘোড়সওয়ার তিরন্দাজ বাহিনী ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়াও তাদের গোলন্দাজ বাহিনীও ছিল। বাবরের সৈন্য সংখ্যা কিন্তু লোদিদের তুলনায় কম ছিল। কিন্তু বাবর ছিলেন যুদ্ধে পটু। যুদ্ধক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদির মৃত্যু হয় এবং দিল্লি ও আগ্রায় মুঘলদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ছবি ৪.২ :
পানিপতের প্রথম যুদ্ধে বাবরের সৈন্যদল।
***বাবরনামা*-র ছবি।**

৪.৭.১ সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : সামরিক নিয়ন্ত্রণ

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে বারবার অভিযানকারীরা ভারতে এসেছে। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে (১২১৮-'২৭ খ্রিঃ) মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খান মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় ঝড়ের গতিতে যে

অভিযান চালান তার সামনে ওই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ভারতেও মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কা তৈরি হলো। দিল্লির সুলতান তখন ইলতুৎমিশ। এই আশঙ্কা পরে চতুর্দশ শতকেও জারি ছিল। মোঙ্গল আক্রমণের সামনে দিল্লির সুলতানদের সকলের নীতি একরকম ছিল না। এবারে দেখা যাক কীভাবে সুলতানরা এই শক্তির মোকাবিলা করেছিলেন।

১২২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে উত্তর-পশ্চিমে বারবার মোঙ্গল আক্রমণ ঘটে। ওই আক্রমণের সামনে সিন্ধু নদ ভারতের পশ্চিম সীমান্ত বলে চিহ্নিত হয়। ইলতুৎমিশ সরাসরি মোঙ্গলদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে দিল্লি সুলতানিকে বাঁচিয়ে দেন।

চেঙ্গিজ মারা যাওয়ার পর মোঙ্গল রাজ্য একাধিক অংশে ভাগ হয়ে পড়েছিল। তাঁরা ওই সময় পশ্চিম এশিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দিল্লির সুলতানরা নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করে নিয়েছিলেন। তাঁরা একটা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকাঠামো ও স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার সময় পেয়ে যান। এর ফলে পরবর্তীকালে মোঙ্গল আক্রমণ ঠেকাতে তাঁদের সুবিধা হয়েছিল।

গিয়াসউদ্দিন বলবন মন্ত্রী থাকার সময়ে (১২৪৬-'৬৬খ্রিঃ) পাঞ্জাবের লাহোর ও মুলতান শহরদুটো পশ্চিম দিক থেকে মোঙ্গল অভিযানের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। দিল্লি সুলতানির পশ্চিম সীমানা পূর্বদিকে আরো সরে আসে। ঝিলাম (বিতস্তা) নদীর বদলে আরো পূর্বদিকে বিপাশা নদী নতুন সীমানা হয়েছিল। বলবন সুলতান হয়ে (১২৬৬-'৮৭খ্রিঃ) তাবরহিন্দ (ভাতিন্দা), সুনাম ও সামানা দুর্গ সুরক্ষিত করেন। বিপাশা নদী বরাবর সৈন্য ঘাঁটি বসান। তিনি নিজে দিল্লিতে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকেন। একই সঙ্গে তিনি মোঙ্গলদের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন কূটনৈতিক চাল হিসাবে। ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গলদের সঙ্গে লড়াইয়ে বলবনের বড়ো ছেলে যুবরাজ মহম্মদ প্রাণ হারান।

আলাউদ্দিন খলজির সময়ে (১২৯৬-১৩১৬খ্রিঃ) দিল্লি দু-বার আক্রান্ত হয় (১২৯৯/১৩০০খ্রিঃ এবং ১৩০২-০৩খ্রিঃ)। সুলতান বিরাট বাহিনী গড়ে তোলেন। সৈনিকদের থাকবার জন্য সিরি নামে নতুন শহর তৈরি হয়। সেনাবাহিনীকে রসদ জোগানোর জন্য দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের উপর বেশি হারে কর চাপানো হয়। দুর্গনির্মাণ, সৈন্যসংগ্রহ ও মূল্যনিয়ন্ত্রণ করে সফলভাবে মোঙ্গল আক্রমণের মোকাবিলা করেন আলাউদ্দিন।

৪.২ ছবিতে কী কী অস্ত্রের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে?

মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে ১৩২৬-২৭/১৩২৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ উত্তর- পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল অভিযান হয়। সুলতান মোঙ্গলদের তাড়া করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কালানৌর ও পেশোয়ারে সীমান্তঘাঁটি মজবুত করেন। তিনি মধ্য এশিয়া অভিযানের পরিকল্পনা করেন, সেজন্য বিরাট সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। সুলতান *পুরোনো দিল্লি* শহরকে সেনা-শিবির বানিয়ে তোলেন। শহরের অধিবাসীদের তিনি দাক্ষিণাত্যে দৌলতাবাদে পাঠিয়ে দেন। সৈনিকদের বেতন দেওয়ার জন্য দোয়াব অঞ্চলে অতিরিক্ত কর চাপান। শেষ পর্যন্ত তাঁর মধ্য এশিয়া অভিযানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। বিরাট সেনাবাহিনী ভেঙে দিতে বাধ্য হন মহম্মদ বিন তুঘলক।

৪.৭.২ সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ

সুলতানি শাসনের প্রধান ব্যক্তি সুলতান নিজে। যুদ্ধ, আইন, বিচার, দেশ চালানোর সব ক্ষমতা সুলতানের হাতে থাকত। তবে একজন ব্যক্তি একা সব দিক সামলাতে পারেন না। তাই সুলতান মন্ত্রী ও কর্মচারীদের নিয়োগ করতেন। তবে সবাইকেই সুলতানের কাছে অনুগত থাকতে হতো। সুলতানের আদেশ ছিল শেষ কথা। এইভাবে সুলতানকে কেন্দ্র করে দিল্লিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে। একেই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা বলে।

কখনও কখনও কে আসলে সুলতান হওয়ার যোগ্য— তা নিয়ে গোলমাল হতো। তাই যিনি যখন সুলতান হতেন, তাঁর চেষ্টা থাকত কেউ যেন তাকে নিয়ে প্রশ্ন না করতে পারে। এর জন্য সুলতানরা নিজেদের সবার থেকে আলাদা করে রাখতেন। আর বিচার করতেন কঠোর হাতে। গরিব বা বড়োলোক, অভিজাত বা সাধারণ মানুষ ভেদাভেদ ছিল না বিচারের সময়ে।

যে সুলতান যত ভালোভাবে সবদিক সামলাতে পারতেন, তাঁর শাসন তত বেশিদিন টিকত। তবে বলবনের সময় থেকে সুলতানের ক্ষমতা ও মর্যাদা বাড়তে থাকে। সুলতানের উপরে কেউ কথা বলতে পারত না। তার বিরোধিতা করলে শাস্তি পেতে হতো। ফলে, অভিজাতরা (*আমির*) আর সুলতানের ক্ষমতা ও মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন করত না। আলাউদ্দিনের সময়ে অভিজাতদের কড়া হাতে দমন করা হয়। কিন্তু, সুলতানের শাসন আলগা হয়ে পড়লেই, অভিজাতদের হাতে ক্ষমতা বেড়ে যেত।

টুকরো কথা

সুলতানি আদবকায়দা

গিয়াসউদ্দিন বলবন চল্লিশচক্র বা বন্দেগান-ই চিহলগানির সদস্য ছিলেন। পরে নিজে যখন সুলতান হলেন, তখন যাতে কেউ তার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন করতে না পারে তার জন্য দরবারে কতগুলি নিয়ম চালু করেন তিনি। শোনা যায় বলবন খুব জমকালো পোশাক পরে দরবারে আসতেন। কোনো হাসি- তামাসা বা হালকা কথা বরদাস্ত করতেন না। গম্ভীরভাবে দরবারে শাসন কাজ চালাতেন। সুলতানকে দরবার চালাতে দেখে অতিথিদের ভয় করত। আলাউদ্দিন ও মহম্মদ বিন তুঘলক একই নীতি নেন। জাঁকজমক করে সাজানো সভার মধ্যে সবচেয়ে দামি পোশাক পরা গম্ভীর সুলতানকে দেখে যে কেউ আলাদা করে চিনতে পারত।

অভিজাত ছাড়াও উলেমার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতে হতো সুলতানকে। যেমন রাজাকে পরামর্শ দিতেন পুরোহিত, তেমনই সুলতানকে পরামর্শ দিতেন উলেমা। তবে বেশিরভাগ সময়েই উলেমার কথা শুনে চলতেন না সুলতানরা। হিন্দু-মুসলমান সব জনগণই সুলতানের প্রজা। ফলে, বাস্তবে শাসন চালাবার জন্যে যা দরকার সুলতানরা তাই করতেন। এই নিয়ে উলেমার সঙ্গে সুলতানদের গোলমালও হতো। সুলতানরা উলেমাকে শাস্তিও দিতেন মাঝেমধ্যে।

তবে নিজেদের ক্ষমতা অটুট রাখতে ওমরাহ ও উলেমার সমর্থনের দরকার হতো সুলতানদের। তাই নানা উপহার ও সম্মান দিয়ে তাদের পাশে রাখতেন সুলতানরা।

সামরিক ব্যক্তিদের হাতে ভূমি রাজস্ব ও প্রশাসনিক দায়িত্ব— ইকতা ব্যবস্থা

সুলতানি শাসনব্যবস্থা প্রথম দিকে পুরোপুরি সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। পরবর্তী সুলতানরাও সামরিক শক্তিকে শাসনব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ বলে মনে করতেন। তবে তারা ধীরে ধীরে একটি সুসংহত, কেন্দ্রীয় প্রশাসন গড়ে তোলেন। নির্দিষ্ট অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীরা সুলতানের নির্দেশে রাজস্ব আদায় করার অধিকার পেতেন।

দিল্লির সুলতানরা সাম্রাজ্যের আয়তন ক্রমশ বাড়িয়ে ছিলেন। নতুন অধিকার করা অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায় করা প্রয়োজন ছিল। সেখানে শান্তি বজায় রাখারও দরকার ছিল। সুলতানরা যে সব রাজ্য জয় করলেন, সেই রাজ্যগুলি এক একটি প্রদেশের মতো ধরে নেওয়া হলো। এই প্রদেশ গুলিকেই বলা হতো *ইকতা*। ইকতার দায়িত্বে থাকতেন একজন সামরিক নেতা। তাঁকে বলা হতো *ইকতাদার* বা *মুক্‌তি* বা *ওয়ালি*। ইকতাগুলিকে ছোটো ও বড়ো এই দু-ভাগে ভাগ করা হতো। ছোটো ইকতার শাসক শুধু সামরিক দায়িত্ব পালন করতেন। আর বড়ো ইকতার শাসকদের সামরিক দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করতে হতো। সৈন্যবাহিনীর দেখাশোনা করা, বাড়তি রাজস্ব সুলতানকে দেওয়া, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ইত্যাদি দায়িত্ব বড়ো ইকতার শাসকদের নিতে হতো। ইকতাদাররা সম্পূর্ণভাবে সুলতানের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন।

টুকরো কথা

উলেমা

আরবি ভাষায় ইল্‌ম মানে হলো জ্ঞান। আলিম মানে হলো জ্ঞানী। বিশেষভাবে যারা ইসলামি শাস্ত্রে পণ্ডিত তাদের বলে আলিম। একের বেশি আলিমকে বলা হয় উলেমা। উলেমা শব্দটিই বহুবচন। তাই উলেমারা বা উলেমাদের কথাগুলো ঠিক নয়।

টুকরো কথা

ইকতা ব্যবস্থার কথা

মধ্য এশিয়ার ইসলামীয় সাম্রাজ্যে সামরিক অভিজাতদের ইকতা দেওয়া হতো। এই ইকতাগুলি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেওয়া হতো। খ্রিস্টীয় নবম শতকে এই ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়। রাজকোষে তখন যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্ব জমা পড়ছিল না। এদিকে যুদ্ধ করেও তেমন ধনসম্পদ পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই সামরিক নেতাদের বেতনের বদলে ইকতা দেওয়া হতে থাকে। খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে সেলজুক তুর্কি সাম্রাজ্যে ইকতা ব্যবস্থার প্রচলন লক্ষ করা যায়। এ সময়ে সাম্রাজ্যের প্রায় অর্ধেক অংশ ইকতা হিসাবে ভাগ করা হয়। কোথাও কোথাও এই ব্যবস্থা বংশানুক্রমিক হয়ে যায়। অর্থাৎ বাবা মারা গেলে তার ছেলে একই দায়িত্ব পায়। অটোমান তুর্কিদের আমলে ইকতা ব্যবস্থার পরিবর্তে একই ধরনের অন্য একটি ব্যবস্থার কথা জানা যায়। তাকে বলা হয় ***তিমার***। *আবার ইরানে ইল-খানদের শাসনের সময়ে (১২৫৬-১৩৫৩খ্রিঃ) ইকতা প্রথার কথা জানা যায়। মিশরেও দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে মুক্তিদের কথা জানা যায়। দিল্লির সুলতানরা সাম্রাজ্য বিস্তার, রাজস্ব সংগ্রহ ও শান্তি-শৃঙ্খলা রাখার জন্য ইকতা ব্যবস্থার নানা রদবদল ঘটিয়েছিলেন। ইকতাদার বা মুক্তি হতে পারতেন একটা গোটা প্রদেশের শাসনকর্তা। অথবা, তিনি হতেন শুধুই একজন রাজস্ব সংগ্রহকারী, যিনি নিজের ভরণপোষণের জন্য একখণ্ড জমি থেকে রাজস্ব আদায় করতেন।*

সুলতানির বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকেরা অনেক সময় কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করতেন। জালালউদ্দিন খলজি অথবা বহলোল লোদির মতো অনেকেই প্রথমে আঞ্চলিক শাসক ছিলেন। পরে তাঁরা কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখল করে সুলতান হন।

৪.৭.৩ সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও জনকল্যাণকর সংস্কার

রাজকোষের আয় বাড়াতে আলাউদ্দিন খলজি কতগুলি অর্থনৈতিক সংস্কার করেন। আগের সুলতানদের দেওয়া ইকতা বাজেয়াপ্ত করেন। ধর্মীয় কারণে দেওয়া সম্পত্তি ও নিষ্কর জমিগুলি ফিরিয়ে নেন। সমস্ত জমি জরিপ করানো হয়। রাজস্বের হারও বাড়ানো হয়। তার পাশাপাশি সুলতান সুলতানির খরচ কমাতেও চেষ্টা করেছিলেন। আলাউদ্দিন দোয়াব অঞ্চলের (গঙ্গা-যমুনা

নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) অধিবাসীদের কাছ থেকে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক অংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করেন। এখানে জমি উর্বর হওয়ায় চাষ হতো খুব ভালো। ভূমি রাজস্ব ছাড়াও গৃহকর, গোচারণভূমি কর, জিজিয়া কর ইত্যাদি কর রাজাদের কাছ থেকে আদায় করার নির্দেশ দেন।

টুকরো কথা

জিজিয়া কর ও তুরুষ্কদণ্ড

অ-মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে মুসলমান শাসকরা জিজিয়া কর আদায় করতেন। এটি ছিল একটি মাথাপিছু কর। এর বিনিময়ে অ-মুসলমানদের জীবন, ধর্ম পালনের অধিকার ও সম্পত্তির সুরক্ষা দেওয়া হতো। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে আরবের সেনাপতি মহম্মদ বিন কাশিম সিন্ধু প্রদেশে প্রথম জিজিয়া কর চালু করেছিলেন।

দিল্লি সুলতানিতে ব্রাহ্মণ, নারী, নাবালক ও দাসদের জিজিয়া দিতে হতো না। সন্ন্যাসী, অন্ধ, খঞ্জ ও উন্মাদ ব্যক্তিরা যদি গরিব হতেন তবে তাদেরকেও জিজিয়া দিতে হতো না। আলাউদ্দিন খলজি খরাজের সঙ্গেই জিজিয়া নিতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রভাবশালী অ-মুসলমান ব্যক্তির আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কমানো। কারণ, সুলতান ভাবতেন তারাই সাম্রাজ্যের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের জন্ম দিত। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (১৩২০-'২৪খ্রিঃ) এমনভাবে জিজিয়া চাপান যাতে অ-মুসলমান প্রজারা একেবারে দরিদ্র না হয়ে পড়ে, আবার তারা মাথা চাড়া দিয়েও উঠতে না পারে। ফিরোজ শাহ তুঘলক খানিকটা ব্যতিক্রমীভাবে ব্রাহ্মণদের উপরেও জিজিয়া কর চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

জিজিয়া করের মতো এক ধরনের কর কোনো কোনো হিন্দু রাজারাও চালু করেছিলেন। এই কর তারা চাপাতেন তাদের মুসলমান প্রজাদের উপর। ওই করকে বলা হতো তুরুষ্কদণ্ড (তুর্কিদের/মুসলমানদের উপর চাপানো কর)।

বাজারদর নিয়ন্ত্রণ

আলাউদ্দিন খলজির শাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। এর মধ্যে তিনি এক বিরাট সৈন্যদল গঠন করেন, এবং ঐ সৈন্যদের বেতন নির্দিষ্ট করে দেন। আলাউদ্দিন বাজারের সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম ঠিক করে দেন। আলাউদ্দিন খলজির আমলে দিল্লিতে চারটি বড়ো বাজার ছিল। এইসব বাজারে খাদ্যদ্রব্য, ঘোড়া, কাপড়

টুকরো কথা

খরাজ, খামস, জিজিয়া ও জাকাত

ফিরোজ তুঘলকের আমলে চার ধরনের কর আদায় করা হয়। এগুলি হলো--- খরাজ– কৃষিজমির উপর আরোপ করা কর। খামস— যুদ্ধের সময়ে লুট করা ধন সম্পদের একটি অংশ। জিজিয়া– অ-মুসলমানদের উপর আরোপ করা কর। জাকাত– মুসলমানদের সম্পত্তির উপর আরোপ করা কর।

ইত্যাদি বিক্রি হতো। বাজারদর তদারকির জন্য 'শাহানা-ই মান্ডি' ও 'দেওয়ান-ই রিয়াসৎ' নামে রাজকর্মচারী নিয়োগ করা হয়। সুলতানের ঠিক করে দেওয়া দামের থেকে বেশি দাম নিলে বা ক্রেতাকে ওজনে ঠকালে কঠোর শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আলাউদ্দিন রেশন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। প্রয়োজনের সময়ে প্রজাদের সুলতানের পক্ষ থেকে খাদ্যশস্য ও রোজের প্রয়োজনীয় জিনিস পরিমাণ মতো জোগান দেওয়া হতো।

ছবি ৪.৩ :
সুলতান আলাউদ্দিন খলজির একটি সোনার মুদ্রার দুটি পিঠ।

মহম্মদ বিন তুঘলকের আর্থিক পরীক্ষার কথা তোমরা আগেই জেনেছো। তাঁর পরবর্তী সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ইসলামের রীতিনীতি এবং উলেমার নির্দেশে শাসন পরিচালনা করতেন। তবে বেশ কিছু জনকল্যাণকর কাজও তিনি করেছিলেন। ফিরোজ রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার করেন। ইসলামীয় রীতি অনুযায়ী যে সমস্ত কর আদায় করা যেতে পারে, শুধু সেই করগুলি নেওয়া হতো। অন্যান্য কর বাতিল করা হয়।

ফিরোজ শাহ তুঘলক একাধিক নতুন নগর, মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল এবং বাগান তৈরি করেন। দরিদ্রদের অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করেন। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি একটি দপ্তর খোলেন। সেখান থেকে চাকরি দেওয়া হতো। তিনি কৃষির উন্নতির জন্য সেচব্যবস্থার উন্নয়ন করেন। বেশ কিছু খাল খনন করা হয়। তাছাড়া যে সব জমিতে চাষ হতো না, সেই জমির সংস্কার করেন সুলতান।

৪.৮ প্রাদেশিক শাসন

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের শেষ দিক থেকেই দিল্লির সুলতানি শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কয়েকটি আঞ্চলিক শক্তির উত্থান হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলায় ইলিয়াসশাহি এবং হোসেনশাহি শাসন, এবং দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর এবং বাহমনি রাজ্যের শাসন।

৪.৮.১ বাংলায় ইলিয়াসশাহি ও হোসেনশাহি শাসন

১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ লখনৌতির সিংহাসন দখল করেন। তিনি বাংলার তিনটি প্রধান রাজ্য লখনৌতি, সাতগাঁ এবং সোনারগাঁ যুক্ত করে বাংলায় স্বাধীন ইলিয়াসশাহি শাসন শুরু করলেন। ইলিয়াস শাহ পূর্ব বঙ্গ এবং কামরূপকে তাঁর শাসনের আওতায় নিয়ে আসেন। দিল্লিতে তখন ফিরোজ শাহ তুঘলক শাসন করছেন। তিনি ইলিয়াসের রাজধানী পাণ্ডুয়া দখল করে নেন।

টুকরো কথা

দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গ

ফিরোজ শাহ তুঘলক যখন পাণ্ডুয়া আক্রমণ করেন, ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। এই দুর্গটির কোনো চিহ্নই আজ আর নেই। দুর্গটি ঘিরে ছিল গঙ্গার দুই শাখা নদী— চিরামতি এবং বালিয়া। গৌড় থেকেও এই দুর্গটি খুব দূরে ছিল না। দুর্গটি প্রায় দুর্ভেদ্য ছিল।

ফিরোজ শাহ সৈন্য সমেত ফিরে যাওয়ার ভান করেন। সে সময়ে ইলিয়াস শাহের সৈন্য একডালা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে ফিরোজ শাহকে পিছন থেকে আক্রমণ করতে যায়। ফিরোজ শাহ তৈরি ছিলেন। যুদ্ধে দিল্লির সুলতান জয়ী হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গ দখল করতে পারেননি। বাংলায় শাসক হিসেবে তাই ইলিয়াস শাহই থেকে গেলেন।

ছবি ৪.৪ : শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহর একটি মুদ্রার দুটি পিঠ।

মনে রেখো

- সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-'৫৮খ্রিঃ) বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান। তিনি দিল্লির সুলতানি শাসনের আওতার বাইরে এই স্বাধীন শাসন তৈরি করেছিলেন।
- সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ছিলেন ফারসি কাব্যের একজন সমঝদার। তাঁর আমলে বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য জোরদার হয়েছিল।
- সুলতান জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ (যদু) (১৪১৫-'১৬, ১৪১৮-'৩৩খ্রিঃ) জন্মসূত্রে হিন্দু ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে বাংলার রাজধানী মালদহের হজরত পাণ্ডুয়া থেকে গৌড়ে চলে আসে।
- অনেকে মনে করেন যে, পরবর্তী ইলিয়াসশাহি সুলতানরা ছিলেন সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহর বংশধর।
- ইলিয়াসশাহি এবং হোসেনশাহি শাসনের মাঝে বাংলায় আবিসিনীয় সুলতানরা শাসন করেছিলেন। এরা আফ্রিকার আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া থেকে এসেছিলেন। বাংলায় এদের হাবশি বলা হয়।
- আফগান নেতা শের খানের আক্রমণে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন শেষ হয়।

ছক ৪.২ : এক নজরে ইলিয়াসশাহি এবং হোসেনশাহি শাসন

শাসন	সময়কাল	প্রধান শাসকবৃন্দ
ইলিয়াসশাহি	১৩৪২-১৪১৪/১৫খ্রিঃ	শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ, সিকান্দর শাহ, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
রাজা গণেশের বংশ	আনু. ১৪১৪/১৫-১৪৩৫খ্রিঃ	রাজা গণেশ, জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ (যদু)
পরবর্তী ইলিয়াসশাহি	আনু. ১৪৩৫-১৪৮৬খ্রিঃ	নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ, রুকনউদ্দিন বরবক শাহ
হোসেনশাহি	১৪৯৩-১৫৩৮খ্রিঃ	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহ

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ছিলেন মধ্যযুগের বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। তাঁর ছাব্বিশ বছরের (১৪৯৩-১৫১৯খ্রিঃ) শাসনকাল বিখ্যাত তাঁর উদারনীতির জন্য। তাঁর রাজত্বে হিন্দুদের দেওয়া হতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ। আলাউদ্দিনের উজীর, প্রধান চিকিৎসক, তাঁর প্রধান দেহরক্ষী ও টাঁকশালের অধ্যক্ষ সবাই ছিলেন হিন্দু। সুলতান হোসেন শাহ স্বভাবে ছিলেন ভদ্র, বিনয়ী এবং সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল। শোনা যায় যে, হোসেন শাহ ছিলেন শ্রীচৈতন্যের ভক্ত। নাম করা দুই বৈষ্ণব ভাই রূপ ও সনাতনের মধ্যে একজন হোসেনের দপ্তরে ব্যক্তিগত সচিব (দবির-ই খাস) পদ পান। সাধারণ মানুষ নাকি হোসেন শাহকে কৃষ্ণের অবতার বলে মনে করত। বাংলা ভাষা চর্চায় ভীষণ উৎসাহী ছিলেন হোসেন শাহ তাঁর শাসনকালে বাংলা ভাষায় লেখালেখির চর্চা উন্নত হয়।

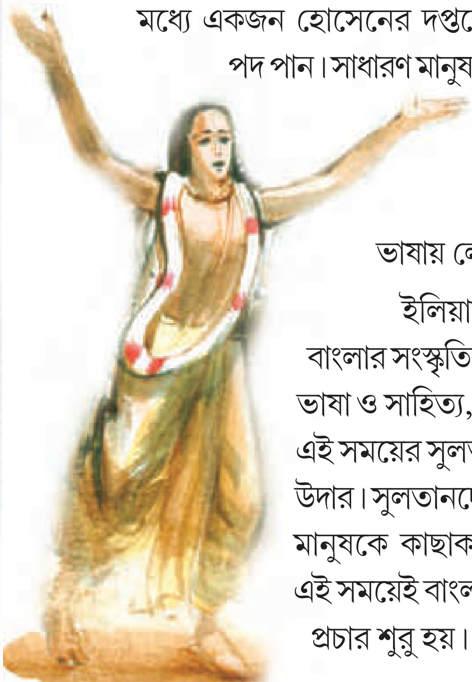

ইলিয়াসশাহি এবং হোসেনশাহি আমলে বাংলার সংস্কৃতির উন্নয়ন হয়েছিল। এই সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, স্থাপত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়। এই সময়ের সুলতানরা ছিলেন অন্য ধর্মমত বিষয়েও উদার। সুলতানদের ধর্মীয় উদারতা বাংলায় সব ধর্মের মানুষকে কাছাকাছি আসতে সাহায্য করেছিলেন। এই সময়েই বাংলায় শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে ভক্তিবাদের প্রচার শুরু হয়।

টুকরো কথা

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ও শ্রীচৈতন্য

বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্য ভাগবত-এ লিখেছেন যে, সুলতান হোসেন শাহ গৌড়ে গিয়ে শ্রীচৈতন্যের সম্পর্কে একটি নির্দেশ দেন। তাতে বলা হয়, চৈতন্যদেব সবাইকে নিয়ে কীর্তন করুন অথবা চাইলে তিনি একাকী থাকুন। তাঁকে যদি কেউ বিরক্ত করে, তা সে কাজি হোক বা কোতোয়াল, তার প্রাণদণ্ড হবে।

৪.৮.২ দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের উত্থান

গল্প আছে যে সঙ্গম নামের এক ব্যক্তির ছেলেরা ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের মধ্যে দুজন হলেন প্রথম হরিহর ও বুক্ক। বিজয়নগরে ১৩৩৬ থেকে ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মোট চারটি রাজবংশ শাসন করেছিল। এই বংশগুলি হলো সঙ্গম, সালুভ, তুলুভ ও আরাবিড়ু।

প্রথম হরিহর ও বুক্ক প্রতিষ্ঠিত সঙ্গম রাজবংশ প্রায় দেড়শো বছর টিকেছিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় দেবরায়। সঙ্গম বংশের দুর্বল শাসক বিরূপাক্ষকে সরিয়ে নরসিংহ সালুভ বিজয়নগরে সালুভ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু অযোগ্য শাসকের জন্য সালুভ রাজবংশের পতন ঘটে। সালুভ রাজবংশের সেনাপতির ছেলে বীরসিংহ সালুভ বংশের উচ্ছেদ ঘটিয়ে তুলুভ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন বিজয়নগর রাজ্যের বিখ্যাত শাসক। তাঁর রাজত্বকালে বিজয়নগরের গৌরব সবচেয়ে বেড়েছিল। সে সময়ে সাম্রাজ্যের সীমা বেড়েছিল। অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল। এছাড়াও শিল্প, সাহিত্য, সংগীত এবং দর্শনশাস্ত্রের উন্নতি তাঁর সময়ে লক্ষ করা যায়। কৃষ্ণদেব রায় নিজেও একজন সাহিত্যিক ছিলেন। তেলুগু ভাষায় লেখা *আমুক্তমাল্যদ* গ্রন্থে তিনি রাজার কর্তব্যের কথা লিখেছেন।

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে হাসান গঙ্গু ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন হাসান বাহমন শাহ নাম নিয়ে দাক্ষিণাত্যে বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গুলবর্গায় রাজধানী স্থাপন করে তার নাম দেন আহ্‌সনাবাদ। শাসনের সুবিধার জন্য বাহমন শাহ তাঁর রাজ্যকে চারটি প্রদেশে ভাগ করেন। এই ভাগগুলি হলো গুলবর্গা, দৌলতাবাদ, বেরার এবং বিদর। প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়।

আলাউদ্দিন হাসান বাহমন শাহের মৃত্যুর (১৩৫৮খ্রিঃ) পর তাঁর ছেলে মহম্মদ শাহ গুলবর্গার শাসক হন। বাহমনি বংশের সুলতান তাজউদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৩৯৭-১৪২২ খ্রিঃ) একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। শিল্পের প্রতিও তাঁর উৎসাহ ছিল।

ছবি ৪.৩ : গুলবর্গা দুর্গের একটি অংশ, উত্তর কর্ণাটক।

টুকরো কথা

রাজা কৃষ্ণদেব রায়

পোর্তুগিজ পর্যটক পেজ রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সময়ে বিজয়নগর রাজ্যে এসেছিলেন। তিনি রাজার খুব প্রশংসা করেছেন। পেজ বলেছেন— " রাজাদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত এবং সর্বোত্তম একজন মহান শাসক এবং সুবিচারক, সাহসী ও সর্বগুণান্বিত"।

এরপর বাহমনি রাজ্যের রাজধানী চলে আসে বিদর শহরে। বাহমনি রাজ্যের শাসক তৃতীয় মহম্মদের শাসনকালে (১৪৬৩-'৮২খ্রিঃ) তাঁর মন্ত্রী মাহমুদ গাওয়ান বাহমনি রাজ্যের গৌরব বাড়িয়ে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা এবং পরিচালক। তাঁর নির্দেশে তৈরি বিদর শহরের মাদ্রাসাটি খুবই বিখ্যাত।

মাহমুদ গাওয়ানের মৃত্যুর (১৪৮১ খ্রিঃ) পর বাহমনি রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসন ভেঙে পড়ে। পাঁচটি স্বাধীন সুলতানির উদ্ভব হয়। সেগুলি হলো আহমেদনগর, বিজাপুর, বেরার, গোলকোন্ডা এবং বিদর।

ছবি ৪.৬ : মাহমুদ গাওয়ানের মাদ্রাসা, বিদর (পঞ্চদশ শতক)

কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর তুলুভ রাজত্বকালেই বিজয়নগরের সঙ্গে বাহমনি রাজ্যের উত্তরসূরি পাঁচটি সুলতানির মিলিত শক্তির যুদ্ধ হয়। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে বানিহাটি বা তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর পরাজিত হয়।

বিজয়নগর এবং বাহমনি রাজ্য দুটি প্রথম থেকেই একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটানা লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রধানত রাজনৈতিক, সামরিক, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্যই এই লড়াই হয়েছিল।

এই যুদ্ধের পরে তুলুভ শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে আরাবিডু বংশ শাসন ক্ষমতায় আসে। এই বংশের প্রথম শাসক ছিলেন তিরুমল এবং শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন দ্বিতীয় বেঙ্কট।

ভেবে বলো

বিজয়নগর এবং দক্ষিণের সুলতানিগুলির মধ্যে তিনটি অঞ্চলকে নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এই অঞ্চল গুলি হলো— তুঙ্গভদ্রা নদীর উপকূলবর্তী অঞ্চল, কৃষ্ণা-গোদাবরী নদীর অববাহিকা অঞ্চল এবং মারাঠওয়াড়া দেশ। এইসব জায়গার জমি উর্বর এবং বাণিজ্যের প্রভাব বেশি ছিল। মনে রেখো এই জায়গাগুলিকে ঘিরে দ্বন্দ্ব শুধু বিজয়নগর এবং বাহমনি রাজ্যের মধ্যে হয়নি। তার আগেও চালুক্য ও চোল রাজাদের মধ্যে এবং যাদব ও হোয়সল রাজাদের মধ্যে এই অঞ্চলকে নিয়ে সংঘর্ষ হয়েছিল।

কৃষ্ণা নদীর উত্তর ও দক্ষিণ—দুই পারের শাসকরাই উপাধি নিতেন 'সুলতান'। দিল্লির সুলতানদের অনেক আদবকায়দা তারা মেনে চলতেন। বিজয়নগরের শাসকরা নিজেদের বলতেন হিন্দু রাইদের (রাজা) মধ্যে সুলতান। রাজা দ্বিতীয় দেবরায় নিজের বাহিনীর জন্য তুর্কি যুদ্ধপদ্ধতি আমদানি করেন। তার আমলে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল।

তাহলে ভেবে দেখোতো, বিজয়নগর ও দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলির সংঘর্ষকে কি হিন্দু ও মুসলমান শাসকদের মধ্যে ধর্মীয় সংঘর্ষ বলা চলে?

মানচিত্র ৪.৬ : বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্য

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

মনে রেখো

- কৃষ্ণা এবং তুঙ্গভদ্রা নদীর অববাহিকা অঞ্চলকে বলা হয় রাইচুর দোয়াব।
- বাহমনি রাজ্যে দেশীয় অভিজাতদের বলা হতো দক্ষিণী। এই অঞ্চলের বাইরে থেকে যে অভিজাতরা এসে দরবারে স্থান পেতেন তাঁদের বলা হতো পরদেশী। অর্থাৎ 'দেশ' বলতে মানুষ কেবল নিজের এলাকাটাই বুঝতো।

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণীতে বিজয়নগর

বিজয়নগর সাম্রাজ্যে বহু বিদেশি পর্যটক আসেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ইতালির পর্যটক নিকোলো কন্টি, পারস্যের দূত আব্দুর রাজ্জাক, পোর্তুগিজ পর্যটক পেজ ও নুনিজ, দুয়ার্তে বারবোসা প্রমুখ। এঁরা সকলেই বিজয়নগরের সম্পদ দেখে বিস্মিত হন। বিজয়নগর শহরটি সাতটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। কৃষিই ছিল জনসাধারণের প্রধান জীবিকা। কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের সুবন্দোবস্ত ছিল। ভূমি রাজস্বই ছিল রাজ্যের প্রধান আয়। কৃষি ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। পোর্তুগিজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। তবে পর্যটকরা একথাও বলেছেন যে ধনী ও গরিবদের জীবনযাপনে অনেক তফাৎ ছিল।

কোনো দেশ বিষয়ে বিদেশি পর্যটকের বিবরণ কি পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায়? এর পক্ষে-বিপক্ষে তোমার কী কী যুক্তি?

টুকরো কথা

পর্যটক পেজের বর্ণনায় বিজয়নগর

“......নগরটি রোম শহরের মতোই বড়ো, দেখতে বড়োই সুন্দর। নগরের ও বাড়িগুলির বাগানের মধ্যে অনেক গাছের কুঞ্জ আছে। স্বচ্ছ জলের অনেকগুলি খাল শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। মাঝে মাঝে আছে দীঘি, রাজপ্রাসাদের কাছেই আছে তালবন ও অন্যান্য ফলের গাছ। এই নগরের লোকসংখ্যা অসংখ্য। রাস্তায় ও অলিতে-গলিতে এত লোক ও হাতি চলাচল করে যে তার মধ্যে দিয়ে অশ্বারোহী বা পদাতিক কোনো সৈন্য যেতে পারে না।

এ শহরটির মতো এত খাওয়া- পরার ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোনো শহরে নেই। এখানে চাল, গম ও অন্যান্য শস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। রাস্তায় ও বাজারে ভারবাহী এত ষাঁড় চলাচল করে যে তাদের মধ্য দিয়ে যাওয়া যায় না, হয়তো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কিংবা অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে হয়।”

ছবি ৪.৭ : বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজধানী হাম্পির একটি রথমন্দিরের আঁকা ছবি।

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১। নীচের নামগুলির মধ্যে কোনটি বাকিগুলির সঙ্গে মিলছে না তার তলায় দাগ দাও :

(ক) ইলতুৎমিশ, রাজিয়া, ইবন বতুতা, বলবন।

(খ) তাবরহিন্দ, সুনাম, সামানা, ঝিলাম।

(গ) খরাজ, খামস, জিজিয়া, আমির, জাকাত।

(ঘ) আহমেদনগর, বিজাপুর, গোলকোণ্ডা, পাঞ্জাব, বিদর।

(ঙ) বারবোসা, মাহমুদ গাওয়ান, পেজ, নুনিজ।

২। 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

'ক' স্তম্ভ	*'খ' স্তম্ভ*
খলিফা	বাংলা
বলবন	দুরবাশ
খলজি বিপ্লব	বাবর
রুমি কৌশল	তুর্কান-ই চিহলগানি
রাজা গণেশ	ইলবারি তুর্কি অভিজাতদের ক্ষমতার অবসান

৩। সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

(ক) দিল্লির সুলতানদের কখন খলিফাদের অনুমোদন দরকার হতো?

(খ) সুলতান ইলতুৎমিশের সামনে প্রধান তিনটি সমস্যা কী ছিল?

(গ) কারা ছিল সুলতান রাজিয়ার সমর্থক? কারা ছিল তাঁর বিরোধী?

(ঘ) আলাউদ্দিন খলজি কীভাবে মোঙ্গল আক্রমণের মোকাবিলা করেন?

(ঙ) ইলিয়াসশাহি এবং হোসেনশাহি আমলে বাংলার সংস্কৃতির পরিচয় দাও।

৪। বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

(ক) ৪.২ মানচিত্র থেকে আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য অভিযানের বিবরণ দাও।

(খ) দিল্লির সুলতানদের সঙ্গে তাঁদের অভিজাতদের কেমন সম্বন্ধ ছিল তা লেখো।

(গ) ইকতা কী? কেন সুলতানরা ইকতা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন?

(ঘ) আলাউদ্দিন খলজির সময় দিল্লির বাজার দর নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে তোমার মতামত লেখো।

(ঙ) বিজয়নগর ও দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলির মধ্যে সংঘর্ষকে তুমি কী একটি ধর্মীয় লড়াই বলবে? তোমার যুক্তি দাও।

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) যদি তুমি সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সময়ে দিল্লির একটি বাজারে যেতে তাহলে কেমন অভিজ্ঞতা হতো তা লেখো।

(খ) মনে করো তুমি আলাউদ্দিন হোসেন শাহের দরবারে একজন রাজকর্মচারী। সে যুগের ধর্মীয় অবস্থা সম্বন্ধে যদি তুমি একটি বই লিখতে তা হলে তাতে কী লিখতে?

(গ) মনে করো তুমি রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের আমলে পোর্তুগাল থেকে বিজয়নগর রাজ্যে বেড়াতে এসেছো। এ দেশের অবস্থা দেখে তুমি নিজের দেশের এক বন্ধুকে চিঠিতে কী লিখবে?

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্য

৫.১ মুঘল কারা?

খ্রিস্টীয়যোড়শ শতক থেকে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মুঘলরা ভারতবর্ষ শাসন করেছিল। অবশ্য খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতক থেকেই তাদের ক্ষমতা অনেক কমে গিয়েছিল। ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির বাস। সেখানে এতবছর ধরে শাসন পরিচালনা করা খুবই কঠিন কাজ। মুঘলরা দক্ষতার সঙ্গেই সেই কাজ চালিয়েছিল।

একদিকে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান এবং অন্য দিকে তুর্কি নেতা তৈমুর লঙ-এর বংশধরদের আমরা মুঘল বলে জানি। মুঘলরা তৈমুরের বংশধর হিসেবে গর্ববোধ করত। নিজেদের তারা তৈমুরীয় বলে ভাবত। বরং, চেঙ্গিস খানের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা কম ছিল। ভারতবর্ষের প্রথম মুঘল বাদশাহ ছিলেন জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর (১৫২৬-'৩০খ্রিঃ)।

সফাবি—সফাবিরা ছিল ইরানের একটি রাজবংশ। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত তারা শাসন করে।

উজবেক—উজবেকরা ছিল মধ্য এশিয়ার একটি তুর্কিভাষী জাতি। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে তারা মধ্য এশিয়ায় একাধিক রাজ্য গড়ে তুলেছিল।

টুকরো কথা

তৈমুর লঙ ও বাবর

১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর লঙ উত্তর ভারত আক্রমণ করেন। তাই মুঘলরা মনে করত উত্তর ভারতে তাদের শাসনের অধিকার আছে। ভারতবর্ষে আসার আগে মুঘলরা মধ্য এশিয়ার কিছু অঞ্চলে শাসন করত। এর আগে চতুর্দশ শতকে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে তৈমুর তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি মধ্য এশিয়ার বেশ কিছু অঞ্চল জয় করেন। এই অঞ্চলগুলি হলো পূর্ব ইরান বা খোরাসান, ইরান, ইরাক, এবং তুরস্কের কিছু জায়গা। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে তৈমুরীয় শাসকদের ক্ষমতায় ভাঁটা পড়ে। এর প্রধান কারণ ছিল তাঁদের বংশধরদের মধ্যে সাম্রাজ্য বিভক্ত করার রীতি। ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে তৈমুরীয় বংশের বাবর মাত্র বারো বছর বয়সে ফরগনা প্রদেশের শাসনভার পান। পরবর্তীকালে মধ্য এশিয়ার রাজনীতিতে উজবেক এবং সফাবিদের মতো সাফল্য না পেয়ে বাবর অবশেষে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হন।

ছবি ৫.১ : খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে আঁকা এই ছবির মধ্যের ব্যক্তিটি তৈমুর লঙ। সঙ্গে তাঁর বংশধররা। এর মধ্যে রয়েছেন প্রথম ছয়জন মুঘল সম্রাট।

বাদশাহ কে?

মুঘলরা সার্বভৌম শাসকের ক্ষেত্রে *পাদশাহ* অথবা *বাদশাহ* শব্দটি ব্যবহার করত। তোমরা দেখেছো আগে দিল্লির শাসকেরা নিজেদের *সুলতান* বলতেন। মুঘলরা কিন্তু সুলতান শব্দটি যুবরাজদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করত। যেমন ধরো, জাহাঙ্গিরের নাম ছিল সলিম। তিনি যখন যুবরাজ হলেন, তখন তাঁকে বলা হতো সুলতান সলিম। বাদশাহ উপাধি ব্যবহার করে মুঘলরা বোঝাতে চাইলো যে, তাদের শাসন করার ক্ষমতা অন্য কারোর অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল নয়।

কথার মানে

বাদশাহ— বাদশাহ বা পাদশাহ বা পাদিশাহ শব্দগুলি ফারসি। *পাদ* অর্থাৎ প্রভু এবং *শাহ* অর্থাৎ শাসক বা রাজা, এই দুটি শব্দ এখানে যোগ হয়েছে। মনে হতে পারে প্রায় একই অর্থবিশিষ্ট দুটি শব্দ পাশাপাশি ব্যবহার করার কারণ কী? খুব শক্তিশালী শাসক বোঝাতে একসঙ্গে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়। ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে বাবর কাবুলে থাকার সময় পাদশাহ উপাধি নেন।

সার্বভৌম শাসক— সার্বভৌম শাসক বলতে বোঝায় সর্ব ভূমির উপর যার আধিপত্য। সর্ব ভূমি বা গোটা পৃথিবীর উপর তো কোনো একজন মানুষের আধিপত্য থাকতে পারে না। অর্থাৎ বুঝতে হবে যাঁর আধিপত্য একটি বিরাট অঞ্চলের উপর থাকে এবং যিনি সেখানে নিজের ক্ষমতায় শাসন করেন, তিনি সার্বভৌম শাসক। এই কথাটি শুধু সেই শাসক নিজে জানলেই হবে না, সবাই সেটা মেনে নিলেই তাঁর অধিকার টিকে থাকবে।

৫.১ ছবিতে যে এগারো জনের ছবি রয়েছে, তারা একসঙ্গে একই সময়ে জীবিত ছিলেন না। তাহলে এমন ছবি আঁকার কারণ কী হতে পারে?

৫.২ মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন ও বিস্তার : যুদ্ধ ও মৈত্রী

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব শুধু যুদ্ধের উপরই নির্ভর করে ছিল না। একদিকে ভারতবর্ষের ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে মুঘলদের সংঘাত হয়েছিল। আবার তাদের সঙ্গে মৈত্রীও হয়েছিল। আমরা আগেই জেনেছি যে, পানিপতের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬খ্রিঃ) বাবর আফগান শক্তিকে পরাজিত করেন। আফগানরা ছাড়াও এই সময় ভারতের আর এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক গোষ্ঠী ছিল রাজপুতরা। রাজপুত শক্তিও বাবরের কাছে পরাজিত হয়। পরবর্তীকালে রাজপুতরা মুঘলদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিল।

টুকরো কথা

মুঘল রণকৌশল

পানিপত ও খানুয়ার যুদ্ধে বাবরের রণকৌশল একদিকে কামান ও বন্দুকধারী সৈন্য এবং অন্যদিকে দ্রুতগামী ঘোড়সওয়ার তিরন্দাজ বাহিনী এই দুইয়ের যৌথ আক্রমণের উপর নির্ভরশীল ছিল। ঘোড়সওয়ার বাহিনীর একটা অংশ শত্রুপক্ষকে দুই পাশ আর পিছন দিক থেকে আক্রমণ করত এবং কামান ও বন্দুকধারী সৈন্যরা সামনে থেকে গোলাগুলি বর্ষণ করত। একসাথে এই দুই রকম আক্রমণে শত্রুপক্ষ যখন দিশাহারা, তখন বাকি ঘোড়সওয়াররা সামনে থেকে আক্রমণ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিত। এই রণকৌশল ব্যবহার করে তুরস্কের অটোমান তুর্কি সেনাবাহিনী ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে চল্‌দিরানের যুদ্ধে পারস্যদেশের রাজশক্তি সফাবিদের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে। আবার অটোমানদের কাছে শিখে একই কৌশল অবলম্বন করে ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে জামের যুদ্ধে সফাবিরা উজবেকদের হারিয়ে দেয়।

একনজরে বাবরের আমলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ

খানুয়ার যুদ্ধ (১৫২৭ খ্রিঃ)— মেওয়াড়ের রানা সংগ্রাম সিংহ (রানা সঙ্গ) রাজপুতদের নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে বাবর মুঘল যোদ্ধাদের বলেন এই যুদ্ধ তাদের ধর্মের লড়াই। তারা হলেন ধর্মযোদ্ধা বা গাজি। আসলে এভাবে তিনি সকলকে জোটবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। আবার, উত্তর ভারত থেকে বাবরকে হটানোর জন্য কয়েকজন মুসলমান শাসকও রাজপুতদের সঙ্গে যোগ দেন। কাজেই এই যুদ্ধ ধর্মীয় যুদ্ধ ছিল না।

ঘর্ঘরার যুদ্ধ (১৫২৯ খ্রিঃ)— আফগানদের বিরুদ্ধে বাবর এই যুদ্ধ করেন। আফগানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন বাংলার শাসক নসরৎ শাহ। এই যুদ্ধে জিতলেও বাবর বিহারে পাকাপাকি অধিকার কায়েম করতে পারেননি।

মুঘল উত্তরাধিকার নীতি

বাবরের সঙ্গে তাঁর সামরিক অভিজাতদের পারিবারিক এবং বংশগত যোগ ছিল। শাসকশ্রেণির সঙ্গে অভিজাতদের এই যোগ মুঘল শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাবরের পুত্র হুমায়ুনের আমলে (১৫৩০-’৪০, ১৫৫৫-’৫৬খ্রিঃ) কিন্তু এই যোগ অনেকটাই আলগা হয়ে পড়ে। তাঁর দুঃসময়ে ভাইয়েরা তাঁকে সাহায্য করেনি।

তৈমুরীয় নীতি মোতাবেক উত্তরসূরিদের মধ্যে যে অঞ্চল ভাগ করার প্রথা ছিল, হুমায়ুন কিন্তু তা মানেননি। বাবরও শাসক হিসাবে হুমায়ুনকেই মনোনীত করে গিয়েছিলেন। হুমায়ুন সাম্রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতেই রেখেছিলেন। ভাইদের কেবল কিছু অঞ্চলের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সরাসরি শাসনের দায়িত্ব না পাওয়ায় তাঁরাও সাম্রাজ্য রক্ষা করার তাগিদ অনুভব করেননি। তাই শেষমেশ একজোট হয়েও আফগানদের বিরুদ্ধে মুঘল বাহিনী জয়ী হতে পারেনি।

কথার মানে

সামরিক অভিজাত

সামরিক অভিজাত তাদের বলা যায় যাঁরা বংশগতভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এছাড়া তারা খুব গুরুত্বপুর্ণ পদও পেতেন। অনেক সময় এঁদের রাজপরিবারের সঙ্গে পারিবারিক যোগ থাকতো।

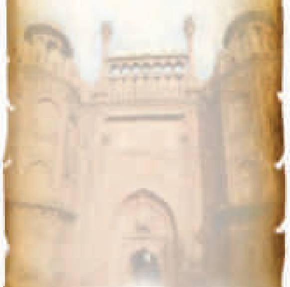

টুকরো কথা

বাবরের প্রার্থনা : সত্যি হলেও গল্প

হুমায়ুন একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তখন সদ্য আফগানিস্তানের বদখশান থেকে ভারতবর্ষে ফিরেছেন। বাবরের কাছে হুমায়ুনের অসুস্থতার খবর পৌঁছল। তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। হুমায়ুন যখন দিল্লি পৌঁছলেন, তখন তিনি এতটাই অসুস্থ যে ঘোরের মধ্যে ছিলেন। শোনা যায় এই সময় বাবরকে একজন পরামর্শ দেন যে, হুমায়ুনের খুব প্রিয় কোনো জিনিস ঈশ্বরকে উৎসর্গ করলে হয়ত তাঁকে বাঁচানো যাবে। তখন বাবর নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। এর পরের গল্পটা কিন্তু ইতিহাস বলে ধরে নেওয়া যায় না। বলা হয় বাবরের প্রার্থনায় হুমায়ুন প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন। এর পরেই বাবর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অবশেষে মারা যান। গল্পকথা হলেও এর থেকে এটুকু বোঝা যায় যে হুমায়ুন ছিলেন বাবরের প্রিয়পুত্র। তাই তিনি হুমায়ুনকেই শাসক হিসাবে মনোনীত করেছিলেন।

টুকরো কথা

মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব

মুঘলদের বিরোধীরা সবসময় একজোট ছিল না। মুঘলদের দুই প্রধান বিরোধী শক্তি রাজপুত এবং আফগানদের মধ্যে বিরোধ ছিল। এদের মধ্যে বিহারে আফগানদের নেতৃত্ব দেন হুমায়ুনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী শের খান। হুমায়ুন পর পর দু-বার শের খানের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে বিহারের চৌসার যুদ্ধে আর ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে কনৌজের কাছে বিলগ্রামের যুদ্ধে। তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে হুমায়ুনকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। এই সময়ে পারস্যের শাহ তাহমস্প হুমায়ুনকে আশ্রয় দেন। হুমায়ুনের এই পালিয়ে বেড়ানোর সময়েই আকবরের জন্ম হয় (১৫৪২ খ্রিস্টাব্দ)। ইতোমধ্যে দিল্লি-আগ্রায় শের খান 'শাহ' উপাধি নিয়ে সম্রাট হন। শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ ক্ষমতায় আসেন। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর যে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়, সেই সুযোগে হুমায়ুন দেশে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু খুব বেশিদিন হুমায়ুন শাসন করতে পারেননি। দিল্লির পুরানো কেল্লার পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তিনি মারা যান।

শের শাহের (১৫৪০-'৪৫ খ্রিঃ) সংস্কার

শেরশাহের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, রাজস্ব ব্যবস্থা ও জনহিতকর কাজের সঙ্গে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ও সম্রাট আকবরের শাসনব্যবস্থার অনেকটা মিল ছিল। শাসন পরিচালনা ও রাজস্ব ব্যবস্থায় শের শাহ কিছু সংস্কার করেছিলেন।

- শের শাহ কৃষককে 'পাট্টা' দিতেন। এই পাট্টা-য় কৃষকের নাম, জমিতে কৃষকের অধিকার, কত রাজস্ব দিতে হবে প্রভৃতি লেখা থাকত। তার বদলে কৃষক রাজস্ব দেওয়ার কথা কবুল করে কবুলিয়ত নামে অন্য একটি দলিল রাষ্ট্রকে দিত।
- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে শের শাহ সড়কপথের উন্নতি করেন। তিনি বাংলার সোনারগাঁ থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সড়ক সংস্কার করান। রাস্তাটির নাম ছিল 'সড়ক-ই আজম'। এই রাস্তাই পরবর্তীকালে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে খ্যাত হয়। এছাড়াও আগ্রা থেকে যোধপুর এবং চিতোর পর্যন্ত একটি সড়ক তৈরি হয়। লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত আরও একটি রাস্তা তৈরি হয়।
- পথিক ও বণিকদের সুবিধার জন্য রাস্তার ধারে ধারে অনেক সরাইখানা তৈরি করা হয়েছিল।
- শের শাহ ঘোড়ার মাধ্যমে ডাক-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করেছিলেন।
- সেনা বাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে 'দাগ' ও 'হুলিয়া' ব্যবস্থা চালু রাখেন শের শাহ।

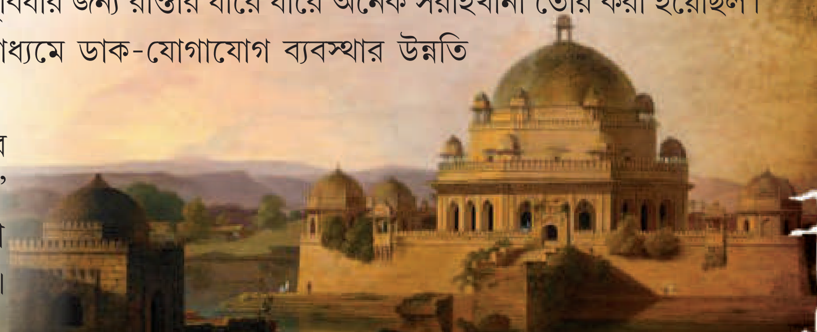

ছবি ৫.২ : শেরশাহের সমাধি সৌধ, সাসারাম, বিহার

ছবি ৫.৩ :
বাদশাহ আকবরের আমলের একটি সোনার মোহরের দুটি পিঠ।

আকবর যখন শাসনভার পেলেন (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ), তখন তাঁর বয়স তেরো। অর্থাৎ তখন তিনি তোমাদেরই বয়সি। ভেবে দেখো এই বয়সে সাম্রাজ্য চালানো কী কঠিন কাজ! আকবরকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর অভিভাবক বৈরাম খান। আঠারো বছর বয়সে আকবর সম্পূর্ণভাবে সাম্রাজ্যের দায়িত্ব নেন। কিন্তু সে তো পরের কথা। যখন তিনি প্রথম সিংহাসনে বসলেন, তখন দিল্লিতে শের শাহের এক আত্মীয় আফগান শাসন ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করছিলেন। তাঁর নাম আদিল শাহ। তাঁর প্রধানমন্ত্রী হিমু দিল্লি শহর দখল করে নেন। তোমরা দেখেছো দিল্লি এবং আগ্রা ছিল সে যুগে শাসনক্ষমতার কেন্দ্র। দিল্লি দখল করা মানেই সাম্রাজ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়া। বৈরাম খানের সাহায্যে আকবর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপতের দ্বিতীয় যুদ্ধে আফগানদের হারিয়ে দেন। আকবর একে একে মধ্য ভারত ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কাছে কয়েকটি ছোটো রাজ্য, চিতোর, গুজরাট, বাংলা ইত্যাদি অঞ্চল জয় করেন। এরপর, মেওয়াড়ের রানা প্রতাপ সিংহের সঙ্গে আকবরের সংঘাত হয়। মুঘলদের বিরুদ্ধে এই সমস্ত গোষ্ঠীর প্রতিরোধকে কিন্তু বহিরাগতদের সঙ্গে ভারতীয়দের সংঘাত বলা চলে না। যারা মুঘলদের বিরোধিতা করেছিল, তারা জোটবদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষের জন্য লড়াই করেনি।

টুকরো কথা

মুঘলদের মেওয়াড় অভিযান

রাজপুত রাজাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল চিতোর দুর্গ। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে আকবর চিতোর জয় করেন। তার আগেই চিতোরের রানা উদয় সিংহ চিতোর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এরপর অন্যান্য রাজপুতদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি হলেও, উদয় সিংহের ছেলে রানা প্রতাপ সিংহ মুঘলদের কাছে অধীনতা স্বীকার করলেন না। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে হলদিঘাটির যুদ্ধে আকবর রানা প্রতাপকে পরাজিত করেছিলেন। এই যুদ্ধের সময় আকবর আজমিরে পৌঁছে রাজা মান সিংহকে ৫০০০ সৈন্য সমেত রানা প্রতাপের বিরুদ্ধে পাঠান। রাজা মান সিংহও কিন্তু রাজপুত ছিলেন। অর্থাৎ মুঘলদের বিরুদ্ধে রাজপুত শক্তি মিলিত হয়ে লড়াই করেনি। রানা প্রতাপ চিতোর পর্যন্ত গোটা এলাকার ফসল নষ্ট করে দিয়েছিলেন যাতে মুঘল সৈন্য খাবার না পায়। তিনি তাঁর রাজধানী কুম্ভলগড় থেকে ৩০০০ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছান। রানার পক্ষে কয়েকজন আফগান সর্দারও ছিল। রানা যুদ্ধে পরাজিত হন। পরাজিত হওয়ার পরেও রানা প্রতাপ সিংহ মুঘলদের বিরুদ্ধে বারবার রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

টুকরো কথা

আকবরের নবরত্ন সভা ও রাজা বীরবল

আকবরের দরবারে বহু বিশিষ্ট মানুষদের মধ্যে ন-জনকে একত্রে বলা হতো নবরত্ন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রাজা বীরবল। বীরবলের বুদ্ধির অনেক গল্পই হয়তো তোমরা পড়েছ। তার অনেকটা গল্পকথা হলেও বীরবল কিন্তু সত্যিই খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। বীরবলের জন্ম হয় মধ্য প্রদেশের একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর নাম ছিল মহেশ দাস। তাঁর বুদ্ধির জোরেই তিনি আকবরের সভায় স্থান পেয়েছিলেন। আকবর তাঁর নাম দেন বীরবল। এখানে বীর এবং বল শব্দগুলি বুদ্ধির জোর বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। তাঁকে 'রাজা' উপাধিও দেওয়া হয়। আকবরের সময় তিনি ওয়াজির-ই আজম বা প্রধানমন্ত্রী হন।

ছবি ৫.৪ :
বাদশাহ আকবরের চিতোর দুর্গ অভিযান। ছবি দুটি *আকবরনামা* গ্রন্থ থেকে নেওয়া।

টুকরো কথা

আবুল ফজল ও আবদুল কাদির বদাউনি

আকবরের আমলের এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন আবুল ফজল আল্লামি (১৫৫১-১৬০২ খ্রিঃ)। তাঁর লেখা আকবরনামায় তিনি আকবরের প্রশংসাই করেছেন। কিন্তু যে কোনো সময়ের ইতিহাস জানতে হলে শুধু ভালো কথা জানলেই হয় না। সে যুগের সমস্যার কথাও জানতে হয়। এই ধরনের সমালোচনা পাওয়া যায় সে যুগের আর একজন ঐতিহাসিক আবদুল কাদির বদাউনির (১৫৪০-১৬১৫ খ্রিঃ) মুন্তাখাব-উৎ তওয়ারিখ বইতে। এঁরা দুজনেই মুঘল দরবারে এসেছিলেন ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু আবুল ফজল হয়ে উঠেছিলেন আকবরের প্রিয় পাত্র। একই ঘটনার দু-ধরনের বিবরণ পাওয়া যায় এঁদের দুজনের লেখায়।

ছবি ৫.৫ :
আবুল ফজল বাদশাহ আকবরকে আকবরনামা উৎসর্গ করছেন।

এখন আমরা ভারতের যে মানচিত্র দেখি, তখন সেরকম ছিল না। 'দেশ' বলতে তারা কেবল কিছু অঞ্চল কে বুঝত। এই সংঘাত আসলে বিভিন্ন অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যে হয়েছিল। এরা সকলেই ব্যক্তিগত উচ্চাশা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য লড়াই করেছিলেন।

আকবর শুধু যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমেই শাসন প্রতিষ্ঠা করেননি। তিনি চেয়েছিলেন স্থানীয় শাসকদের মুঘল দরবারে গুরুত্বপূর্ণ পদ দিতে। স্থানীয় মানুষের কাছে কেবল আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকতে চাননি আকবর। মুঘলরা উত্তর ভারত জয় করে দাক্ষিণাত্যেও পৌঁছে গিয়েছিল। এদিকে আবার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল যেমন কাবুল, কাশ্মীর, কান্দাহার, সিন্ধু প্রদেশ এবং পূর্ব বেলুচিস্তানও মুঘলদের শাসনের আওতায় চলে আসে। ভারতবর্ষের উপর বিদেশি আক্রমণ এই পথেই বেশি হতো। তাই সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করতে এই অঞ্চলে মুঘল প্রভাব তৈরি করা দরকার ছিল। তখনকার যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটেও উন্নত ছিল না । মুঘল সৈন্যকে অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল।

তোমরা আর কোথাও রাজা বীরবলের গল্প পড়েছো? পড়ে থাকলে সেই গল্পটা নিজের ভাষায় লেখো।

আকবরের মৃত্যুর সময় (১৬০৫ খ্রিঃ) ভারতবর্ষের এক বিরাট এলাকা মুঘলদের দখলে চলে এসেছিল। তবে তার বাইরে দক্ষিণ ভারতের বিরাট অঞ্চল ও উত্তর-পূর্ব ভারতে মুঘলদের অধিকার বলবৎ হয়নি। বাংলায় মুঘলরা সামরিক সাফল্য পেলেও, তার ভিত্তি ছিল নড়বড়ে। সেখানে আফগানদের পুরোপুরি হারিয়ে মুঘল শাসন ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করতে আরও বেশ কয়েক বছর লেগে গিয়েছিল।

মানচিত্র ৫.১ :
খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের গোড়ায় মুঘল সাম্রাজ্য

আকবরের ছেলে ও উত্তরসূরি জাহাঙ্গিরের সময়ে (১৬০৫-১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ) বাংলার স্থানীয় হিন্দু জমিদার ও আফগানরা মুঘলদের বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহ করেছে। এই বিদ্রোহীরা এক সঙ্গে 'বারো ভুঁইয়া' নামে পরিচিত ছিলেন। এদের মধ্যে প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, কেদার রায়, ইশা খান প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। জাহাঙ্গির বাংলার জমিদারদের নিজের দলে টানার চেষ্টা করেন। জাহাঙ্গিরের সময়েই বাংলা ভালো ভাবে মুঘল সাম্রাজ্যে যুক্ত হয়ে পড়ে। তাঁর আমলে মেওয়াড়ের রানাও মুঘলদের আধিপত্য মেনে নেন। তবে মুঘলরা কিন্তু সব রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেনি। যেমন ধরো, শিখদের সঙ্গে মুঘলদের সম্পর্ক ভালো থাকেনি (এই সম্বন্ধে আমরা আরও জানব অষ্টম অধ্যায়ে)।

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে মুঘল রাষ্ট্রকাঠামোয় জাহাঙ্গির মোটামুটিভাবে আকবরের নীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটতে থাকে। ফলে নতুন নতুন মনসবদাররা মুঘল

ছবি ৫.৬ :
জাহাঙ্গিরের আমলের একটি সোনার মোহরের দুটি পিঠ।

শাসনব্যবস্থায় শামিল হতে থাকে। এ ছাড়া আগে থেকে রাজপুতরা তো ছিলই। আবার, মুঘল দরবারের অভিজাতদের মধ্যেও রেষারেষি চলত। দরবারি অভিজাতদের মধ্যে দ্বন্দ্বে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান, শাহজাদা খুররম (পরবর্তীকালে বাদশাহ শাহজাহান), নূরজাহানের পরিবারের সদস্যরা ও অন্যান্য কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

শাহজাহানের শাসনের (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ) শুরুতেই দাক্ষিণাত্যে খান জাহান লোদী বিদ্রোহ করেন। মুঘলদের কাছে তিনি পরাজিত হন। বুন্দেলখন্দের বিদ্রোহ দমন করা এবং আহমেদনগরে অভিযান পাঠানো হয়। শাহজাহান উজবেকদের থেকে বলখ জয় করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তা সফল হয়নি। শাহজাহানের আমলেই মুঘলরা কান্দাহারের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়।

টুকরো কথা

বলখ এবং বদখশান

মধ্য এশিয়ায় বলখ এবং বদখশান ছিল বুখরার উজবেক শাসক নজর মহম্মদের অধীনে। তাঁর পুত্র আবদুল আজিজ বিদ্রোহ করেন এবং পিতাকে পরাজিত করেন। নজর মহম্মদ বাদশাহ শাহ জাহানের সাহায্য চান। পরে পিতা-পুত্রের মধ্যে সম্পর্ক ভালো হলেও মুঘলরা বলখ আক্রমণ করে। মনে রেখো, মধ্য এশিয়ায় মুঘলদের প্রাচীন বাসভূমি সমরকন্দ। তারা বারবার এই অঞ্চলে ক্ষমতা কায়েম করার চেষ্টা করেছিল।

ছবি ৫.৭ :
মুঘলদের দৌলতাবাদ অভিযান। ছবিটি আবদুল হামিদ লাহোরির *পাদশাহনামা* থেকে নেওয়া।

শাহজাহানের জীবনের শেষদিকে তাঁর ছেলেদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে লড়াই বেধে গিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দারাশিকোহ্ ও অন্য ভাইদের হটিয়ে ঔরঙ্গজেব বাদশাহ হয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে (১৬৫৮-১৭০৭খ্রিঃ) দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা অনেক চেষ্টায় মুঘলদের দখলে আসে। ফলে মারাঠা ও দক্ষিণী মুসলিম অভিজাতরা মুঘল শাসনে যোগ দেয়। এর ফলে মনসবদারি ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য বেড়েছিল। কিন্তু তার সঙ্গে মনসব পাওয়া নিয়েও অভিজাতদের মধ্যে রেষারেষি তৈরি হয়েছিল। কৃষিব্যবস্থায় কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। মথুরায় জাঠ কৃষকরা এবং হরিয়ানায় সৎনামি কৃষকরা বিদ্রোহ করে। শিখ এবং মারাঠাদের মতো আঞ্চলিক শক্তি মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়েছিল। রাজপুতদের সঙ্গে সংঘাত এবং দাক্ষিণাত্যে একটানা চলতে থাকা যুদ্ধে সাম্রাজ্যের আয়তন যেমন বেড়েছিল, সমস্যাও বেড়েছিল। মুঘলদের সঙ্গে বিভিন্ন অভিজাত গোষ্ঠীর যে যোগসূত্র তৈরি হয়েছিল, তা অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট হয়। মুঘল সাম্রাজ্যকে তারা ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষায় ব্যবহার করার চেষ্টা করে।

ছবি ৫.৮ :
ঔরঙ্গজেব ও দারাশিকোহ্-র মধ্যে সামুগড়ের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ঔরঙ্গজেব জয়ী হন।

শাসনের শুরুতেই ঔরঙ্গজেব উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেছিলেন। অসমের অহোম শাসককে প্রথমে দমন করা গেলেও, তা খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মুঘলরা চট্টগ্রাম বন্দর দখল করে বাংলাকে পোর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে। সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কখনো যুদ্ধ কখনো মৈত্রীর নীতির মাধ্যমে আফগান অধ্যুষিত অঞ্চলে শান্তি স্থাপন করেন ঔরঙ্গজেব। কিন্তু এখানে মুঘল সৈন্যের একটি বড়ো অংশ বহুদিন ব্যস্ত ছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন মারাঠাদের বিরুদ্ধে তাদের ব্যবহার করা যায়নি।

বাবর থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত মুঘল সম্রাটদের নাম ও শাসনকালের একটি তালিকা তৈরি করো।

৫.৩ মুঘলদের রাজপুত নীতি ও দাক্ষিণাত্য নীতির চরিত্র : আকবর থেকে ঔরঙ্গজেব

৫.৩.১ মুঘল ও রাজপুতদের মধ্যে সম্পর্ক

মুঘল বাদশাহ হুমায়ুন বুঝেছিলেন যে, হিন্দুস্তানের ক্ষমতা দখল করতে গেলে রাজপুত রাজাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখা দরকার। কারণ, রাজপুতরাই ছিল উত্তর ভারতের বিশাল অঞ্চলের জমিদার। পরে এই ধারণা থেকেই বাদশাহ আকবর মৈত্রী ও যুদ্ধনীতির সাহায্যে রাজপুতদের মনসবদারি ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে এলেন। মুঘল বাদশাহ ও শাহজাদাদের সঙ্গে কোনো কোনো রাজপুত পরিবারের মেয়েদের বিয়ে হলো। এক্ষেত্রে আকবর কিন্তু নতুন কিছু করেননি। এর আগেও মুসলমান শাসকদের সঙ্গে হিন্দু রাজপরিবারের মেয়েদের বিয়ে হতো। আকবর নিজের স্ত্রীদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার বজায় রেখেছিলেন। তিনি হিন্দুদের ওপর থেকে তীর্থ কর ও জিজিয়া কর তুলে নেন। যুদ্ধবন্দিদের জোর করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করাও তিনি নিষিদ্ধ করেন। এতে সাম্রাজ্যের অ-মুসলমান প্রজারা খুশি হয়েছিল। তবে মেওয়াড়ের রানা প্রতাপ সিংহ আকবরের অধীনতা স্বীকার করেননি। এ সম্বন্ধে আমরা আগেই পড়েছি।

টুকরো কথা

ওয়াতন

ওয়াতন কথাটির মানে হলো নিজের ভিটে বা এলাকা, স্বদেশ। যেমন, রাজা ভারমল, ভগবন্তদাস ও মানসিংহের বংশের ওয়াতন ছিল আধুনিক জয়পুর শহরের কাছে অম্বর বা আমের এলাকা।

আকবরের নীতির ফলে মুঘলরা বীর রাজপুত যোদ্ধাদের পাশে পেয়েছিল। রাজপুতরাও ওয়াতনের বাইরে মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র সুনামের সঙ্গে কাজ করার ও বীরত্ব দেখানোর সুযোগ পায়। মুঘল বাদশাহের সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করে নিলে রাজপুতরা ওয়াতনের ওপর অধিকার বজায় রাখতে পারত। তবে কোনো রাজপুত রাজ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে গোলমাল হলে মুঘলরা সেই রাজ্য সাময়িকভাবে পুরোপুরি হাতে নিয়ে নিত। তারপর মুঘল বাদশাহের ইচ্ছা অনুযায়ী গদিতে নতুন শাসক বসতেন।